তৃতীয় অধ্যায়

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর মহকুমার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই দেশের বিভিন্ন রাজ্য, জেলাকে বহুবার খণ্ডিত করা হয়েছে।এবং এখনও সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।১৯৪৭সালে বাংলা ভাগের সঙ্গে দিনাজপুর জেলাও দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এর পূর্বাংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পশ্চিমাংশ ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয়। নব গঠিত এই জেলার নাম হয় পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।যোগাযোগ ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল পশ্চিম দিনাজপুর জেলাকে পুনরায় দুই ভাগে ভাগ করা হয়।[১] যার উত্তর অংশের নাম হয় উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিন অংশের নাম হয় দক্ষিন দিনাজপুর।

১।পুরাকথাঃ

কাহিনি,কিংবদন্তি ও মিথ-পুরাণ অনুসারে বহু পূর্ববর্তী যুগ থেকেই দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিচয় পাওয়া যায়।মহাভারত মতে ক্ষত্রিয় রাজা বলি ছিলেন নিঃসন্তান।তাঁর পত্নী সুদেষ্ণার সঙ্গে দীর্ঘতমা ঋষির মিলনে অঙ্গ,বঙ্গ,কলিঙ্গ,সুক্ষ্ম ও পুন্ড্র নামে পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম হয়।পরবর্তীকালে তাঁরা নিজের নিজের নামে পাঁচটি রাজ্যের প্রতিষ্টা করেন।তখন বিস্তীর্ন এই অঞ্চলের অধীশ্বর হন পুন্ড্র এবং এই দেশ পুন্ড্রদেশ নামে পরিচিত লাভ করে।[২]ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে-‘‘প্রাচীনকালে ইহা একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল।বগুড়ার সাত মাইল দূরে মহাপ্রস্থান গড়ই প্রাচীনপুন্ড্রবর্ধন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া পন্ডিতেরা অনুমান করেন,কারণ মৌর্যযুগের একখানি শিলালিপিতে এই স্থানটি পুন্ড্রনগরী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।’’[৩]

দিনাজপুর অঞ্চল প্রভাবশালী পরশুরামের শাসনাধীন ছিল।তিনি জাতিতে ছিলেন ব্রাক্ষন ও শিবের ভক্ত।শিব ঠাকুর তকে ‘পরশু’ নামে এক অস্ত্রদান করেছিলেন।এই পরশুরামই বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার বলে কথিত। রামায়ণের কালে দিনাজপুর অঞ্চলেই রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বনবাস দিয়েছিলেন বলে কথিত।কিংবদন্তী অনুযায়ী বাল্মীকি মুনি এই এলাকায় করতোয়া নদীর তীরে বাস করতেন।যেখানে এই নদীতে তিনি প্রতিদিনই ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন।যেখানে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত সে স্থান এখনও তর্পণঘাট নামে পরিচিত।অতীতের সেই তর্পণ ঘাটই বর্তমান তপন থানার তপন দিঘি। এর কাছেই রয়েছে সীতাকোট ও সীতাকুন্ড নামে একটি জায়গা।রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাদেবী সেখানেই বাস করতেন

এবং জলাশয়ে স্নান করতেন।[৪]

মহাভারতের যুগের বিরাট রাজার সঙ্গে এই অঞ্চলের নানান কাহিনি জড়িয়ে আছে।বিরাট রাজার অশ্বশালা ছিল ঘোড়াঘাট অঞ্চলে। রাজার অশ্বগুললিকে করতোয়ার জলে স্নান করানো হত বলে ঐ স্থানের নাম ছিল 'বাজিঘট্ট'। বিরাট রাজার গোশালা ও রাজপ্রাসাদ ছিল বর্তমান হরিরামপুর থানার 'বৈরাট্টা' অঞ্চলে। যেখানে পথের ধারে আজও রয়েছে মহাভারতীয় যুগের শমীবৃক্ষটির অবশিষ্টাংশ। 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ২৩/১০/২০০৭ তারিখে সমিত ঘোষ 'শমীবৃক্ষ' নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনিও বৈরহাট্টা অঞ্চলের শমীবৃক্ষটি প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সহমত পোষন করেছেন। পান্ডবরা অজ্ঞাতবাসকালে এখানে এসে বিরাট রাজার গোশালায় ছদ্মবেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বলে কথিত।[৫]

এখানে প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এখানেই নাকি দুর্যোধনের সৈন্যরা বিরাট রাজার গোধন অপহরণ করতে এসেছিল। জনশ্রুতি পান্ডবরা অজ্ঞাতবাস কালে বিরাট নগরে প্রবেশের পূর্বে শমীবৃক্ষের কোটরে অস্ত্র লুকিয়ে রাখে। মহাভারতে উল্লেখ আছে-

''অর্জ্জুন বলেন, এইদেখ শমীদ্রুম।
ভয়ঙ্কর শাখা তার পরশিছে ব্যোম।।
আরোহিতে না পারিবে অন্য কোন জন।
ইহাতে রাখি যে অস্ত্র, যদি লয় মন।।''[৬]

কথিত আছে যে অজ্ঞাতবাস কালে দ্রোপদী সহ পঞ্চপান্ডব পায়ে হেঁটে কালিন্দী নদী পেরিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মৎস্য দেশে প্রবেশ করেছিলেন। মৎস্যরাজ বিরাটের রাজধানী বৈরাট্টা নগরে তারা এসেছিলেন। স্থানীয় মানুষ বলেন, ওই যে বিরাট রাজার দেশ, তাঁর রাজপ্রসাদ, দক্ষিনে গোগৃহ। রাজার গোশালার অসংখ্য গরুর জলপানের জন্যই যেন খনন করা হয়েছিল একাধিক দিঘি। গড়দিঘি, আলতাদিঘি, মালিয়ানদিঘি গুলি এখনও রয়েছে। অদূরে হাতিডোবার বাঁধানো ঘাটটি রানি ও রাজকন্যাদের স্নানের জন্য ব্যবহার হত।[৭] 'বর্তমান' পত্রিকাতেও এই দিঘিগুলি যে প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে তা নিয়ে লেখা হয়।[৮]

বিরাট রাজার শ্যালক কীচক রাজাও শ্রীমতী নদীর ধারে দেহাবন্দে প্রাসাদ নির্মান করে বসতি গড়েছিলেন। বর্তমানে গঙ্গারামপুর মহকুমার কুশমন্ডি থানায় দেহাবন্দ অবস্থিত।কথিত যে,বিরাট রাজার প্রাসাদে ছদ্মবেশ ধরে দ্রৌপদী রাজার মহিষী সুদেষ্ণার পরিচারিকা রূপে বাস করেছিলেন।সেই সময় দ্রৌপদীকে অপমান করার জন্য ভীম কীচক রাজা ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিহত করেন। তাদের দেহ এখানেই দাহ করা হয়।যে জলাশয়ের সামনে তাদের দাহ করা হয় ,বৈরাট্টা গ্রামে ওই জলাশয়টি আজও কীচককুন্ড নামে স্মৃতি বহনকরে চলেছে।[৯]

কুশমন্ডি থানার করঞ্জী নামক গ্রামটিও পুরাণকথিত।কংস রাজার দেহ নারায়ণের সুদর্শন চক্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে তিন জায়গায় পড়ে।তার একটি খন্ড পড়েছিল করঞ্জী গ্রামে।এখানে এখনও রয়েছে বহু ভাঙ্গা স্তূপ ,ঢিবি ও অজস্র পাথরের টুকরো। প্রতিবছর মাঘ মাসের পূর্ণিমায় এখানে এখনও কংসব্রত উৎসব পালিত হয়।[১০] করঞ্জীকে অনেকে ধর্মপালের রাজধানী করনজা বলে অনুমান করেন।এখানে ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি ত্রি-বিক্রমের মূর্তি পাওয়া গেছে।[১১]

মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, পান্ডবদের অজ্ঞাতবাস কালে শকুনি গুপ্তচর রূপে থাকার সময় প্রাচী দেশের বিবরণ দেন। অনুমিত হয় যে, প্রাচী দেশের ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে এখানকার প্রচুর মিল আছে।এই অঞ্চলের নামই পুন্ড্রদেশে।পুন্ড্রবর্ধন বাংলার সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন নগর ।পঞ্চম শতক থেকে শুরু করে পাল সাম্রাজ্যের অবসান কাল পর্যন্ত প্রায় ৫০০বছর ধরে পুন্ড্রবর্ধনের মর্যাদা ও গৌরব অম্লান ছিল। পুন্ড্র দেশের দুটি প্রাচীন নগর ছিল– কোটিবর্ষও গৌড়পুর।কোটিবর্ষ ও দিনাজপুর একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বিখ্যাত জৈন পন্ডিত ভদ্রবাহু কোটিবর্ষেরই অধিবাসী ছিলেন।বর্তমান গঙ্গারামপুরই ছিল ভদ্রবাহুর জন্মস্থান।মহাবীরের শিষ্য জম্বুস্বামী এই অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করতে এসে এখানেই দেহত্যাগ করেন। গোবর্ধনাচার্য এই অঞ্চলে এসে ভদ্রবাহুকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে জৈনধর্মের প্রসার দিনাজপুর জেলার প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কারের বিস্তারের ইঙ্গিতের সাক্ষ্য বহন করে। ‘বৃহৎ কথা কোষ’ গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে নানা তথ্য জানা যায়।[১২]

পৌরাণিক যুগে এই জেলার শাসনকর্তা ছিলেন বলি রাজা। বলির মৃত্যুর পর এই জেলা শাসিত হয় তার পুত্র বান কর্তৃক।সুপ্রসিদ্ব বানের নামে তার রাজ্যের নাম হয়

বানরাজ্য।যার রাজধানী হল বানগর। যা গঙ্গারামপুর থানার পাশেই অবস্থিত।এর পাশেই রয়েছে পুনর্ভবা ও ব্রাহ্মনী নদী। এইনদীর তীরেই বান রাজার কন্যার ঘর ঊষাতিটি ছিল। যা এখনও গঙ্গারামপুর থানায় অবস্থিত। কথিত যে দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধ বানগরে এসেছিলেন কৃষ্ণের আদেশে দৌতকার্য করতে। তাঁর সঙ্গে বানদুহিতা ঊষার দেখা হয় ও তারা পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হন। রাজা-রানীর অনুমতি ছাড়াই সখী চিত্রাঙ্গদার মধ্যস্থতায় তাঁদের গোপনে গন্ধর্ব বিয়ে হয়।তারপর একদিন অনিরুদ্ধ ঊষাকে নিয়ে কাওকে কিছু না বলে রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন করেন।তারা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন সেই রাস্তাটির নাম ঊষাহরন সড়ক।যা বর্তমানে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্গত। বানরাজা কন্যার পলায়নের কথা জানতে পেরে লোক পাঠিয়ে অনিরুদ্ধকে ধরে কারাগারে বন্দি করেন। স্বয়ংশ্রীকৃষ্ণ সেই সংবাদ পেয়ে সৈন্য সামন্ত সহ অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করতে আসেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বানের মধ্যে ভীষন যুদ্ধ হয়।বান অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পরাজিত হন।[১৩] বানের নিহত সেনাদের আঙুল কেটে যে স্থানে দাহ করা হয় তার নাম হয় ‘করদহ’। যা বর্তমানে তপন থানার অন্তর্গত।[১৪]

২।ইতিহাসঃ

প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত কোটিবর্ষ বা দেব কোটি নগরের ধ্বংসাবশেষ বা ইতিহাস খ্যাত বানগড় বর্তমানে দক্ষিন দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অদূরেই অবস্থিত। ১৯৩৭ সাল থেকে বানগড় খননের কাজ শুরু হলেও পাকাপাকি ভাবে খনন শুরু হয় ১৯৩৮ সালের ৬ই মার্চ।কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ইতিহাসবিদ কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত মোট চার পর্যায়ে (১৯৩৭-৩৮,১৯৩৮-৩৯,১৯৩৯-৪০,১৯৪০-৪১ খ্রি)বানগড়ের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারের জন্য খনন চলে। এই খনন কার্যের ফলে বানগড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও বহু অনাবিষ্কৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই বানগড়ই যে মৌর্যযুগের কোটিবর্ষ নগর এবং অতীত ইতিহাসের একটি অফুরন্ত তথ্য ভান্ডার– তা আজ নিঃসংশয় ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।ঐতিহাসিক কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর মতে-

"Moreover the Mahasthan inscription (EP Ind vol. -XXI page 85) prove that pundranagar (Moder Mahasthan on the river Karotoya in Bogra District) was the seat of Mahamatra during the rule of the Mourya emperors. Whereas Pundranagar was in possession of the Mourya kings, it is not unreasonable to suppose that Kotivarsha or Modern Bangarh also came their administration. The art of Bangarh

of that Period Proves beyond doubt a Well - established of Society."[১৫]

গবেষকরা বলেন যে, পাল রাজা দেবপালের নামানুসারে এই অঞ্চল দেবকোট নামে পরিচিত হয়। দেবকোট প্রাচীন বান গড়েরই কাছাকাছি,অভিন্ন স্থান, দেবকোট বানগড় সংলগ্ন এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রাম। পাল বংশের তৃতীয় রাজা দেবপালের নামে জনপদটি দেবকোট বলে পরিচিতি লাভ করে। পুনর্ভবা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই সমৃদ্ধ নগর শুধু গুপ্ত যুগ থেকে শাসনকেন্দ্র রূপেই নয় ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে এবং আন্তর্জাতিক স্থলপথ ও বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র রূপেও এই নগরের পরিচিতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সু-প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাল-সেন রাজন্যবর্গের নির্মিত পরিখাবেষ্টিত দুর্গ ছিল এই নগরে। ছিল রাজকীয় প্রাসাদ, ছিল হিন্দু-বৌদ্ধদের মন্দির বিহার, ছিল অনেক বড় বড় দিঘি জলাশয় । মৌর্য আমলে দেবকোটের নাম ছিল কোটিকপুর, যার অপর নাম কোটিবর্ষ নগর। পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তির অধীনে কোটিবর্ষ বিষয়ের সমৃদ্ধ নগর এই দেবকোট। মৌর্যযুগ থেকে শুরু করে বঙ্গদেশে যে কটি স্থানে নগরায়নের কাজ শুরু হয়েছিল তার মধ্যে প্রাচীনতম ছিল মহাস্থান গড়। তারপরেই ছিল দেবকোট।[১৬]

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেছিলেন -''মুসলমান অধিকারের পর পুরাতন কোটিবর্ষ নগরই দেবীকোট-দীবকোট- দীওকোট নামে নূতন নগরের পত্তন হয়।'' ধনঞ্জয় রায় নীহাররঞ্জনের এই মতকে উদ্ধৃত করে পরে তিনি বলেছেন যে তিনি এই উক্তিকে যথার্থ বলে মনে করেন না। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন -''তুর্কি বিজয়ের অনেক আগে থেকেই দেবকোট ছিল সমৃদ্ধ জনপদ। গঙ্গারামপুর থানার অধীনে রাজীবপুর থেকে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে, মদন পাল দেবের ৩২ তম রাজ্য বর্ষের ভূমিদান হয়েছিল কোটিবর্ষ বিষয়ের অধীনে হলবর্ত্ত মন্ডলে দেবীকোটের কোষ্ঠাগার সংলগ্ন। এই ভূমিদান করা হয়েছে দেবীকোট নিবাসী ব্রাহ্মণ মহেশ্বর রতি শর্মাকে। তাছাড়া, আনুমানিক ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে পাল রাজাদের শক্তির প্রথম অভ্যুদয়ের কালে বাংলার মাটি থেকে ধর্মকে নিয়ে হানাহানি বলা যায় সম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মানুষের মধ্যে ছিল সহজ ও স্বাভাবিক ভ্রাতৃত্ববোধ। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণু মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বল্লাল সেনের সময়ে। বাংলার শেষ স্বাধীন নরপতি লক্ষ্মন সেন রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে তাঁর পিতার পথে না হেঁটে বৌদ্ধদের সঙ্গে অসহযোগিতা করে ইসলামপন্থী সুফিসাধকদের সঙ্গে আপস রফার মনোভাব নিয়ে শাসন কাজ চালাতে থাকলেন। তিনি শেখ মখদুম শাহজালাল আব্রিজীকে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য

প্রয়োজনীয় জমি ও তাঁর অনুরোধে বাইশ হাজার পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয় এই রকম গ্রাম সমূহ দান করেন। এই সময় দিনাজপুর অঞ্চলে শুধু নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গেই অনেকেই শেখের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও কর্মক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মে তারিখে তুর্কিবীর বখ্তিয়ার যেদিন দেবকোটে আসেন, সেদিন তাঁকে তাই স্বাগত জানানোর লোকের অভাব ছিল না। ওইদিনই বখ্তিয়ার দিনাজপুরের মাটিতে বিজয় পতাকা প্রোথিত করেন এবং দেবীকোট তুর্কিদের মুখের উচ্চারণে পরিবর্তিত রূপ নিয়ে বাংলার মানচিত্রে দেখা দেয় দেওকোট-দেবকোট - দীওকোট রূপে।''[১৭]

পাল যুগের পরবর্তীকালে বাংলায় সেন রাজাদের রাজত্ব শুরু হয়। এঁদের রাজত্বকাল তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত হলেও বল্লাল সেনও লক্ষ্মন সেনের আমলে সাম্রাজ্য বেশ বিস্তার লাভ করে। এই সময় দিনাজপুর এলাকার বহু অঞ্চল তাঁদের শাসনাধীনে আসে। তপন থানার মনহলি গ্রাম থেকে লক্ষ্মণ সেনের উৎকীর্ণ একটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। আনুমানিক ১১৮১ সালের এই তাম্রলেখ ইতিহাসে 'মনহলি তাম্রশাসন' নামে খ্যাত। তপন দিঘি থেকে প্রাপ্ত লক্ষ্মন সেনের অপর তাম্রশাসনে বরেন্দ্রভূমির বেলাহিস্তি নামক একটি গ্রাম দানের উল্লেখ রয়েছে।

দিনাজপুরের এই দুই জেলায় পাল ও সেন যুগের অজস্র ঐতিহাসিক উপাদান নিদর্শনরূপে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এগুলির মধ্যে তপনদিঘি , ধলধিঘি, কালদিঘি, মালিয়ানদিঘি, গৌড় বা গড়দিঘি, আলতাদিঘি প্রভৃতি। পুকুর খননের সময় এখনও কালো পাথরের তৈরি বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্বেই হরিরামপুর থানার ইটালমাটির পুকুর থেকে বেশ কিছু মূর্তি উদ্ধার হয়েছে। বংশীহারি থানার নওপাড়া গ্রামে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বহু চার -পাঁচ ফিট উচ্চতার মূর্তি ছিল বলে জানা যায়। যার ভাঙা দুই চারটি ব্রজবল্লভপুর গ্রামপঞ্চায়েের পূর্বপ্রান্তে আজও পড়ে রয়েছে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অযত্নে পড়ে থাকা বহু মূর্তি চোরাপথে বিক্রি করে দিয়েছে। যেগুলি উদ্ধার হয়েছে সেগুলির কিছু বালুরঘাট কলেজ মিউজিয়ামে এবং জেলা প্রত্ন বিভাগের মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। আর কিছু কিছু নিয়ে যাওয়া হয়েছে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে।

বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ সেন মধ্যাহ্নভোজনে বসে যখন শোনেন অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে 'নওদীয়াহ' শহরের প্রবেশদ্বারে বখ্তিয়ার উপস্থিত হয়েছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই সবকিছু ফেলে দিয়ে খালি পায়ে খিড়কির পথে পালিয়ে নৌকায় চড়ে তিনি পূর্ববঙ্গের

দিকে যাত্রা করেন। বিনা রক্তপাতে তিনি গৌড় রাজ্য বিজয়ের পথ খুলে দেন। ফলে বখ্‌তিয়ারের দেবকোটে এসে ইসলামীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। দেবকোট থেকেই বখ্‌তিয়ার তিব্বত অভিযানে যান (১২০৬ খ্রীঃ)। প্রচুর সেনা নিয়ে তিব্বত যাবার পথে বাধা পেয়ে তিনি পুনরায় দেবকোটে ফিরে আসেন। এরপর তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য মারা যান। অনেকে বলেন অনুচর মর্দানার হাতে তিনি নিহত হন।

এরপর দেবকোটের নতুন সুলতান হলেন আলি মর্দান। আলি মর্দানের মৃত্যুর পরও (১২১৩ সাল) ১২২৭ সাল পর্যন্ত সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইউয়জ খিলজীর শাসনকালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেবকোটেই ছিল তাঁদের রাজধানী এবং শাসকদের প্রধান কর্মস্থল। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে - ''বখতিয়ারের জীবদ্দশায় এবং তাঁহার মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পর পর্যন্ত বর্তমান দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেবকোট (আধুনিক নাম গঙ্গারামপুর) বাংলার মুসলিম শক্তির প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল।''[১৮]

১২১০ খ্রীষ্টাব্দে ইউয়জ খিলজীর শাসনকালে দেবকোট থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ে লখনৌতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনও দেবকোটের গুরুত্ব কিন্তু হ্রাস পায় নি। মোঘল আমল থেকে দেবকোটের গুরুত্ব হ্রাস পেতে শুরু করে।[১৯] এরপর নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে দেবকোটের ইতিহাস এগিয়ে চলে। পরবর্তীকালে (১২৮২ সালে) বাংলার শাসক হন গিয়াসউদ্দিন বলবনের পুত্র বুঘরা খান। তখন তিনি তাঁর রাজ্যকে প্রধান চারটি অংশে ভাগ করেন। এই চার অংশের মধ্যে দেবকোট অন্যতম প্রধান বিভাগ ছিল।

এর বেশ কিছুকাল পরে ১৩৪২ সালে ইলিয়াস হাজি ষড়যন্ত্র করে আলাউদ্দিন আলি শাহকে হত্যা করে শামস্‌উদ্দিন ইলিয়াস শাহ নাম গ্রহণ করে লখনৌতি রাজ্যের সুলতান হন। এই সময় দিল্লির সুলতান ছিলেন ফিরোজ শাহ তুঘলক শামস্‌উদ্দিন ইলিয়াস শাহ বিভিন্ন রাজ্য জয় করার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন তুঘলক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অনেক অঞ্চল দখল করে নেন। ফলে ফিরোজ শাহ তুঘলক ক্রুদ্ধ হন এবং ১৩৫৩ সালে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে বঙ্গ আক্রমণ করেন। তখন ইলিয়াস শাহ লোকজন সরিয়ে একডালা নামক দুর্গে আশ্রয় নেন। ইতিহাসখ্যাত একডালা দুর্গই সেসময় হয়ে উঠেছিল ইলিয়াস শাহের প্রধান আশ্রয়স্থল এবং যুদ্ধ পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একডালা দুর্গটি বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কুশমণ্ডি থানার অধীনে। শ্রীমতী ও বালিয়া নদীর মধ্যবর্তী আবেষ্টনীর মধ্যে একডালা দুর্গের অবস্থানের কারণে অতি সহজেই ইলিয়াস শাহ দিল্লির সুলতানের আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ ফিরোজ শাহ

তুঘলক বাংলা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইলিয়াস শাহ যথারীতি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই একডালা দুর্গের ধ্বংসাবশেষের কিছুকিছু ঐতিহাসিক চিহ্ন এখনও দেখা যায়।

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র সিকন্দর শাহ (১৩৫৮-৯১) সুলতান হন। ১৩৫৯ সালে ফিরোজ শাহ তুঘলক আবার বঙ্গ আক্রমণ করেন। কিন্তু একডালা দুর্গের ভৌগলিক অবস্থান যথারীতি তাঁর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সিকন্দর শাহকে সাহায্য করে। সিকন্দর শাহই দেবকোটের বিখ্যাত সাধক মৌলানা আতা শাহের সমাধিতে একটি মসজিদ তৈরি করান। বাংলার সুলতানি আমলে ইলিয়াসশাহি বংশের অবসানকালে একমাত্র হিন্দু রাজা ছিলেন গণেশ (১৪১৫-১৮)। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা গণেশ দিনাজপুরের এই অঞ্চলের ভাতুড়িয়ার বিখ্যাত অগ্নিদার ছিলেন। 'ভাতুড়িয়া' উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ থানার অন্তর্গত ভাতুড়া অঞ্চল বলে মনে করা হয়।

এখানকার চারিদিকে গোলাকার পরিখা ওপ্রাচীন ইটের ছড়াছড়ি দেখে স্থানীয় মানুষরা অঞ্চলটিকে 'গণেশের গড়' বলে থাকেন।[২০] ইলিয়াস শাহি বংশের সুলতানদের আমির ছিলেন তিনি এবং ইলিয়াস শাহ ও সিকন্দর শাহের দরবারে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি বাংলার সুলতানি যুগের একমাত্র হিন্দুরাজা। তিনি 'দনুজমর্দনদেব' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন এবং মাত্র কয়েক বছর রাজত্ব করেন। 'দনুজমর্দনদেব' নামে বাংলা হরফে খোদাই করা মুদ্রাও তিনি বের করেন। ঐতিহাসিকদের ধারনা, সম্ভবত এই 'দনুজ' কথাটি থেকেই দিনাজপুর নামের উৎপত্তি। এ প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত হল- ''The District of dinajpur, the name being given as Dinawj or Danoj (Danuj) in Persian histories, Unquestionably Preserves his name.''[২১]

রাজা গণেশের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু সেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দিন নাম নিয়ে দুই দফায় রাজত্ব করেন। প্রথমবার ১৪১৫ সাল থেকে১৪১৬সাল এবং দ্বিতীয়বার১৪১৮সাল থেকে ১৪৩৩সাল পর্যন্ত। এই সময়েও দিনাজপুরের এই অঞ্চলের রাজনৈতিক গুরত্ব যথেষ্ট ছিল বলে মনে করা হয়।

পরবর্তীকালে ১৪৯৩ সালে রাজনৈতিক পটপরির্বতনের মধ্য দিয়ে সুলতান হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। সম্ভবত ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কারণে তিনি গৌড় নগরী থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করে একডালায় নিয়ে আসেন। এই সময় দিনাজপুরের

এই এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ গুরত্ব প্রাপ্ত হয়। রায়গঞ্জ থানার মিরুয়ালে 'ফকিরদিঘি' নামে হোসেন শাহের স্মৃতি বিজড়িত একটি দিঘি রয়েছে। বুকানন হ্যামিলটনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দিনাজপুরের অন্তর্গত রায়গঞ্জ থানার ছোটপাঁড়ুয়া নামক স্থানে হোসেন শাহের একটি আবাসস্থল ছিল এবং ছোট পাঁড়ুয়া সে সময় একটি শক্তিশালী মুসলিম শাসনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সম্ভবত দিনাজপুরের হিন্দু সামন্তদের শায়েস্তা করার জন্য দমদমা (দেবকোটের অপর নাম) ও ঘোড়াঘাট দুর্গটিকে হোসেন শাহ আরও শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। বুকানন সাহেব দিনাজপুর জেলা পর্যটনকালে হেমতাবাদ থানা(উঃদিনাজপুর) এলাকায় রাজা মহেশের (সম্ভবত গণেশের) রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন। এছাড়া নিকটে আরও একটি ইটের তৈরি 'তখত্' এর বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর লেখায়-''About a mile half beyond this ruin is another, which has been surrounded by a brick well, and is usually called the Tukht or throne of Hoseyn (Badshah) the king.'' এই 'তখত্' -এর উচ্চতা কুড়ি ফুট এবং মাথা পিরামিড়ের আকৃতি। এই 'তখত্' নাকি কন্যার বিয়ের সময় হোসেন শাহ নির্মাণ করেন।

হোসেন শাহের মৃত্যুর (১৫১৯ সাল) পর ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত তাঁর বংশধরগন রাজত্ব করেন। এরপর বাংলায় আফগান শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে।বিভিন্ন উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৫৮৫ সালে বাংলা আকবরের মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। শাষনকার্যের সুবিধার জন্য ১৬০০ সালে সম্রাট অকবর মোগল সাম্রাজ্যকে পনেরোটি সুবায় ভাগ করেন। এই সময় পুত্র সেলিমকে সুবা বাংলার শাসক করে পাঠান। প্রশাসনিক কারণে তখন সুবা বাংলাকে চব্বিশটি 'সরকারে' (আধুনিক জেলায়) ভাগ করা হয়। এ ব্যবস্থায় দিনসাজপুর অঞ্চলে ছয়টি সরকার গঠন করা হয়।

ইভি ওয়েষ্ট ম্যাকোট সাহেবের 'The Territorical Aristocracy of Bengal-The Dinajpur Raj' গ্রন্থ থেকে জানাযায় যে, কাশী নামক এক সাধক ব্রহ্মচারীকে কেন্দ্র করে দিনাজপুর রাজের উত্থান ঘটে।কালী ও কৃষ্ণের ভক্ত কাশী হাবেলি পিঞ্জরা সরকার বিশাল ভূ সম্পত্তির অধিকারী হন । এই যোগী পুরুষের মৃত্যুর পর শ্রীমন্ত দত্ত নামে তাঁর এক শিষ্য সমস্ত সম্পত্তি লাভ করেন। অপুত্রক শ্রীমন্ত দত্তের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তাঁর দৌহিত্র শুকদেব রায়।তিনি নিজ ক্ষমতাবলে জমিদারির আয়তন ও সম্পদের পরিমান বৃদ্ধি করেন। তাঁর এই বিশাল জমিদারি ও সম্পত্তির মধ্য ও উত্তরাংশ পিঞ্জরা সরকারের অধীন এবং পশ্চিমাংশ তাজপুর সরকারের অধীন ছিল। আর জনতাবাদ সরকারের অধীন ছিল বংশীহারি ও গঙ্গারামপুরের বেশ কিছু অংশ।

শুকদেব রায়ের মৃত্যুর (১৬৭৭ সাল) পর তাঁর পুত্র প্রাণনাথ জমিদারি লাভ করেন। তিনি 'রাজা' উপাধি নিয়ে প্রায় চল্লিশ বছর (১৬৮২-১৭২২) জাঁকজমকপূর্ণভাবে রাজত্ব করেন। তিনিই প্রানসাগর নামক দিঘিটি খনন করান। এরপর অপুত্রক প্রাণনাথের দত্তক পুত্র রামনাথ(১৭২২-১৭৬০ সাল) রাজা হন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিষয় সম্পদকে তিনি আরও বাড়িয়ে তোলেন। রাম সাগর নামক দিঘিটি তাঁর আমলেই খনন করা হয়।রামনাথের মৃত্যুর পর দিনাজপুরের রাজসিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র বৈদ্যনাথ (১৭৬০-১৭৮০ সাল)। এই সময় ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি লাভ করে।

১৭৮০সালে খুব অল্প বয়সে কোনও উত্তরাধিকারী না-রেখেই মারা যান রাজা বৈদ্যনাথ।তখন বিধবা পত্নী রানী সরস্বতী রাধানাথকে দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহন করেন।উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ(মোহর) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দিয়ে রানী বৈদ্যনাথের উত্তরাধিকারীরূপে রাধানাথের স্বীকৃতির ব্রিটিশ সনদ লাভ করেন।১৭৯২ সালে রাধানাথ রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহন করেন ।আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হওয়ায়,কোম্পানির বিপুল পরিমান খাজনা পরিশোধের জন্য রাজ্যের কিছুটা অংশ তাঁকে বিক্রয় করতে হয়।১৮০১ সালে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

তখন রাধানাথের বিধবা পত্নী প্রাণসুন্দরী গোবিন্দনাথকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন।১৮১৭ সালে গোবিন্দনাথ রাজ্যের দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন এবং পূর্বপুরুষদের ভূসম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। ১৮৪১ সালে গোবিন্দ নাথের মৃত্যুর পর দিনাজপুরের রাজা জমিদারির ভার তাঁর পুত্র তারকানাথের ওপর ন্যস্ত হয়। অপুত্রক তারকনাথ ১৮৬৫ সালে পরলোকগমন করেন। তাঁর বিধবা পত্নী রানী শ্যামমোহিনী দেবী জমিদারি দেখাশোনার জন্য গিরিজানাথকে দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহন করেন। গিরিজানাথের মৃত্যুর (১৯১৯ সাল) পর তাঁর পুত্র জগদীশনাথ দিনাজপুরের রাজা হন । তিনি দিনাজপুরের শেষ রাজা। তাঁর সময়েই ১৯৪৭ সালে ইংরেজ রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে । তখন জগদীশনাথ পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে চলে আসেন এবং ১৯৬২ সালে দেহত্যাগ করেন।

এইভাবে নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে নবজাত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি নতুন জেলা হিসাবে পশ্চিম দিনাজপুরের উদ্ভব ঘটে। আর ১৯৯২ সালে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ভেঙ্গে গঠিত হয় উত্তর ও দক্ষিন দিনাজপুর জেলা দুটি।

দিনাজপুর রাজের বংশ[২২]

শ্রীমন্ত দত্ত

↓

কন্যা

↓

শুকদেব রায়(১৬৪২-১৬৭৭)

↓

জয়দেব (১৬৭৭-১৬৮২)

↓

প্রাণনাথ(১৬৮২-১৭২২,জয়দেবের ভাই)

↓

রামনাথ(১৭২২-১৭৬০)

↓

বৈদ্যনাথ(১৭৬০-১৭৮০)

↓

সরস্বতী(বৈদ্যনাথের বিধবা পত্নী)

↓

রাধানাথ(দত্তক পুত্র, মৃত্যু-১৮০১)

↓

প্রাণসুন্দরী(রাধানাথের বিধবা পত্নী)

↓

গোবিন্দনাথ(দত্তকপুত্র,১৮১৭-১৮৪১)

↓

তারকনাথ(১৮৪১-১৮৬৫)

↓

শ্যামমোহিনী(তারকনাথের বিধবা পত্নী)

↓

গিরিজানাথ(দত্তক পুত্র,১৮৭৮-১৯১৯)

↓

জগদীশনাথ(১৯১৯-১৯৬২)

↓

জলধিনাথ(১৯২৫-১৯৪১)

↓

৩) ভৌগোলিক পরিচয়ঃ

১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল পশ্চিম দিনাজপুর জেলাকে ভেঙ্গে উত্তর ওদক্ষিন দিনাজপুর জেলা গঠিত হয়। দক্ষিন দিনাজপুর জেলায় দুইটি মহকুমা- বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর।

৩.১ অবস্থানঃ

দক্ষিন দিনাজপুর জেলাটি ২৫° ১০′ ৫৫″ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯° ০′ ৩০″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। গঙ্গারামপুর মহকুমাটি আবার ২৫° ৪০′ ৩৭″ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮° ৫৩′ ৩১″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।[২৩]

৩.২ সীমানাঃ

দক্ষিণ দিনাজপুরের চতুর্দিকে যারা অবস্থিত -

পূর্বেঃবাংলাদেশ।

পশ্চিমেঃমালদা ও উত্তর দিনাজপুর জেলা।

উত্তরেঃবাংলাদেশ ও উত্তরদিনাজপুর জেলা।

দক্ষিনেঃবাংলাদেশ ওমালদা জেলা।

গঙ্গারামপুর মহকুমা র চতুর্দিকে যারা অবস্থিত -

পূর্বেঃকুমারগঞ্জ থানা।

পশ্চিমেঃউত্তর দিনাজপুর ও মালদা জেলা।

উত্তরেঃবাংলাদেশ ও উত্তর দিনাজপুর জেলা।

দক্ষিণেঃ মালদা ও তপন থানা।

গঙ্গারামপুর মহকুমাটি শুধু মালদা বা উত্তর দিনাজপুর জেলার সঙ্গেই যুক্ত নয়, পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গেও যুক্ত।অন্যান্য থানা,জেলা ও দেশের সঙ্গে যুক্ত থাকায় মহকুমাটিতে সামাজিক, রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

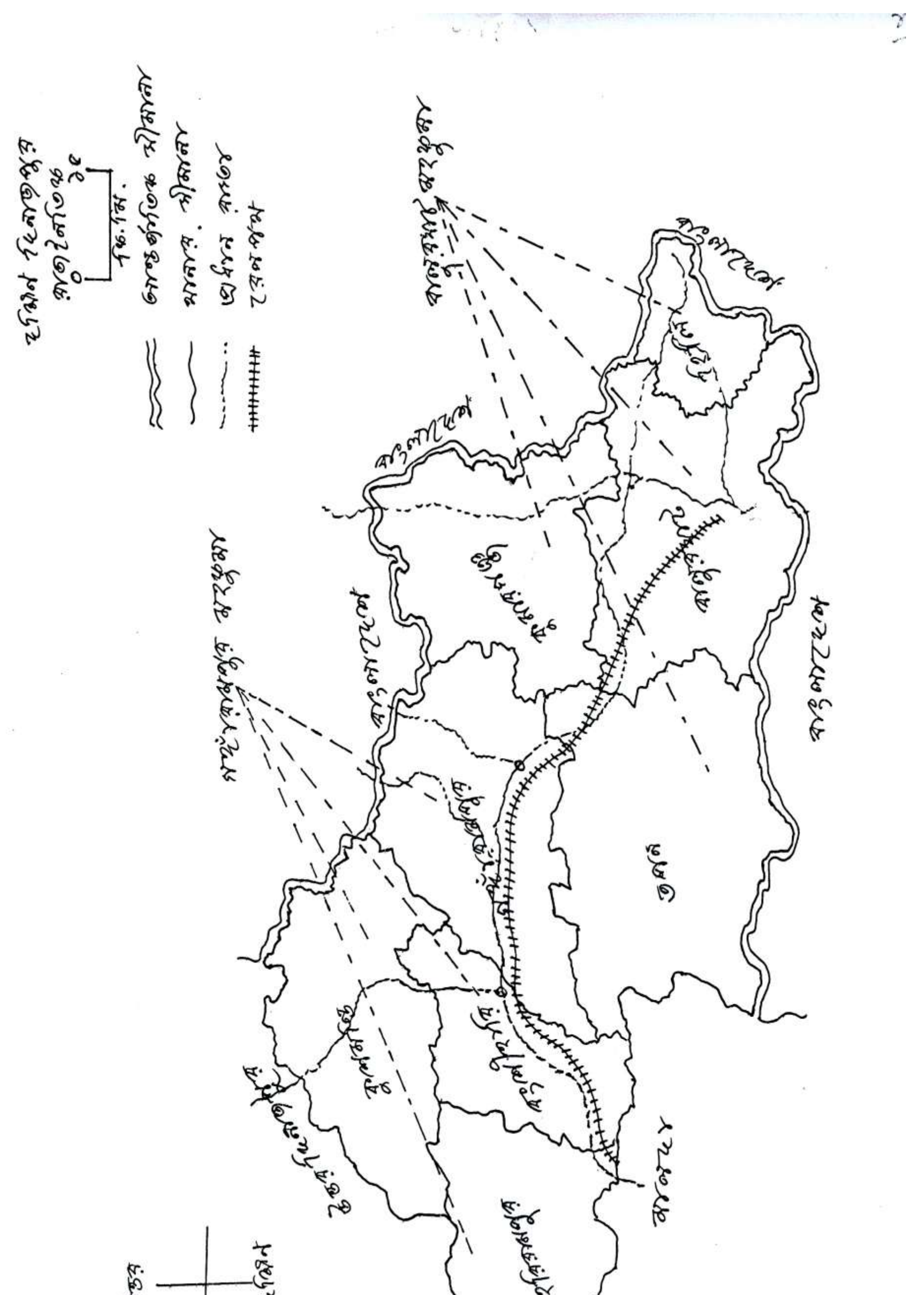

আয়তন

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মোট আয়তন ২২১৯.০০বর্গকি.মি.

বালুরঘাটমহকুমা-

১।বালুরঘাট থানা-৩৬৮.৭৪ বর্গ কি.মি.

২।হিলি থানা-৯০.৭৯ বর্গ কি.মি.

৩।কুমারগঞ্জ থানা-২৮৬.৬৩ বর্গ কি.মি.

৪।তপন থানা-৪৪৫.৬৩ বর্গ কি.মি.

গঙ্গারামপুর মহকুমাঃ

১।গঙ্গারামপুর থানা- ৩১৫.৫২ বর্গ কি.মি.

২।বংশীহারি থানা- ১৯৬.৫২ বর্গ কি.মি.

৩।হরিরামপুর থানা- ২০৪.৬৮ বর্গ কি.মি.

৪।কুশমন্ডি থানা- ৩১০.৬৪ বর্গ কি.মি.

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দক্ষিন দিনাজপুর জেলার ভৌগোলিক সীমারেখা বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে এই জেলার আয়তন গত সামগ্রিক রূপটিও বারবার পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ২৩ শে ফ্রেব্রুয়ারি ৫৪৮ নং জিএ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মোট থানার সংখ্যা হয় ১০টি।যথা-

১।বালুরঘাট ২।কুমারগঞ্জ ৩।গঙ্গারামপুর ৪।তপন ৫ রায়গঞ্জ ৬।হেমতাবাদ ৭।বংশীহারি ৮।কুশমন্ডি ৯।কালিয়াগঞ্জ ও১০।ইটাহার।

আবার ১৯৪৮ সালের ৮ ই মে ১৯৫০ নং বিজ্ঞপ্তি দিয়ে হিলি থানা তৈরি হয়।১৪/০৭/৪৮ তারিখে ২১৩৯ নং জিএ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ৬টি থানা নিয়ে রায়গঞ্জ মহকুমা গঠিত হয়-

১।রায়গঞ্জ ২।হেমতাবাদ ৩।বংশীহারি ৪।কুশমন্ডি ৫।কালিয়াগঞ্জ ও ৬।ইটাহার।

অপরদিকে ১।বালুরঘাট ২।হিলি ৩।কুমারগঞ্জ ৪।গঙ্গারামপুর ও ৫।তপন থানা গুলি নিয়ে

গঠিত হয় বালুরঘাট মহকুমা।

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর ৩৮৫৯ নং বিজ্ঞপ্তির দ্বারা চোপড়া থানা গঠিত হয়।এই ভাবে ইসলামপুর, গোয়ালপুকুর থানা গুলি গঠিত হয়।১৯৫৬ সালের ২রা নভেম্বর৩৮৭৫ নং বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সঙ্গে বিহারের পূর্নিয়া জেলার কিছু অংশ সংযুক্ত হয়।ফলে এই জেলার উত্তর পশ্চিম অংশের আয়তন বৃদ্ধি পায়।এবং নবলব্ধ এলাকা নিয়ে ইসলামপুর মহকুমা সৃষ্টি হয়। এবারে তিনটি মহকুমায় যে যে থানা গুলো পড়ে-

ইসলামপুরঃ- ১।ইসলামপুর ২।চোপড়া ৩।গোয়ালপুকুর (১নং) ৪।চাকুলিয়া (গোয়ালপুকুর ২নং) ৫।করণদিঘি।

বালুরঘাটঃ-১।হিলি ২।বালুরঘাট ৩।কুমারগঞ্জ ৪।গঙ্গারামপুর ৫।তপন

৬।রায়গঞ্জঃ-১।রায়গঞ্জ ২।হেমতাবাদ ৩।কালিয়াগঞ্জ ৪।ইটাহার ৫।বংশীহারি ৬।কুশমন্ডি।

১৯৮১ সালে বংশীহারি থানা থেকে বৈরহাট্টা, বাগিচাপুর, শিরশি ও পুন্ডরি অঞ্চল এবং ইটাহার থানা থেকে গোকর্ণ ও সৈয়দপুর অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় হরিরামপুর থানা। ১৯৯৬ সালে হরিরামপুর বংশীহারি ব্লক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক ব্লকের মর্যাদা লাভ করে। সবশেষে ১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল পশ্চিম দিনাজপুর জেলাকে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর নামে দুটি জেলা বিভক্ত করা হয়। এর ফলে চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপুকুর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ ও ইটাহার এই নয়টি থানা উত্তর দিনাজপুর জেলাভুক্ত হয়। এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় পড়ে কুশমন্ডি, হরিরামপুর, বংশীহারি, গঙ্গারামপুর, তপন, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট ও হিলি এই আটটি থানা। উত্তর দিনাজপুরে গঠিত হয় দুইটি মহকুমা - ইসলামপুর ও রায়গঞ্জ এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে গঠিত হয় বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর মহকুমা। হরিরামপুর, কুশমন্ডি, বংশীহারী ও গঙ্গারামপুর থানা নিয়ে তৈরি হয় গঙ্গারামপুর মহকুমা এবং অপর চারটি থানা নিয়ে বালুরঘাট মহকুমা।[২৪]

৩.৪ **নদী ও জলাশয় ঃ** দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাটি নদীমাতৃক জেলা। শুধু নদী বা বড়ো খাঁড়ি নয়, এখানে প্রচুর বড় বড় দিঘি, বিল দেখা যায়। এই জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত নদী ও নদগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হয়।

টাঙ্গনঃ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে টাঙ্গন নদ পিরগঞ্জ ও বোচাগঞ্জ হয়ে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানার সংযোগকারী সীমানা দিয়ে ভারতে প্রবেশ

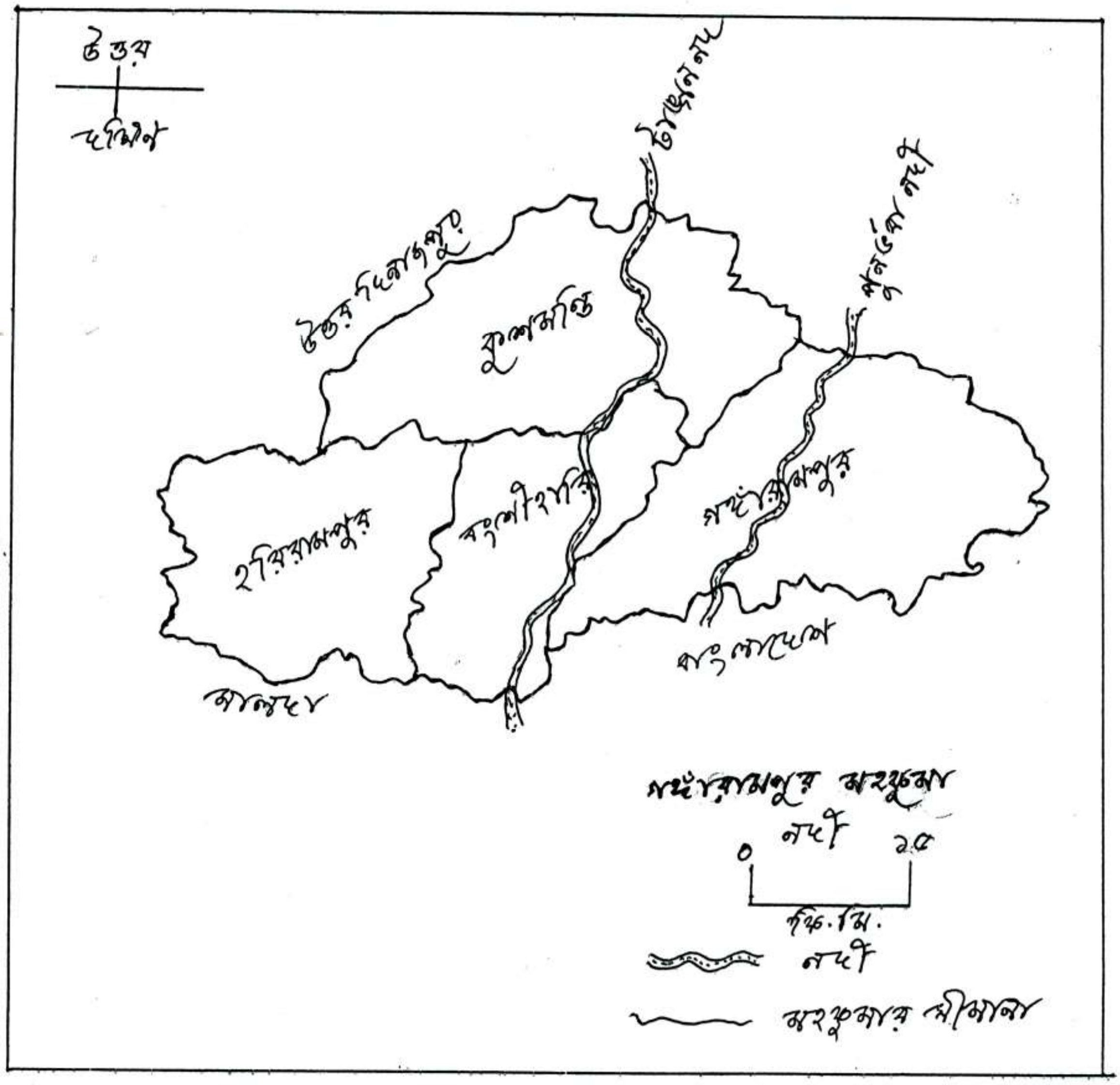
উত্তর
দক্ষিণ
উত্তর দিনাজপুর
টাঙ্গন নদ
পুনর্ভবা নদী
কুশমণ্ডি
বংশীহারী
হরিরামপুর
গঙ্গারামপুর
বাংলাদেশ
মালদহ
গঙ্গারামপুর মহকুমা
0
২৫
কি.মি.
নদী
মহকুমার সীমানা

করেছে। তারপর দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডি ও বংশীহারী থানার মধ্য দিয়ে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে মালদা জেলায় প্রবেশ করেছে। নদীটি বেশ গভীর ও প্রশস্ত বলে পূর্বে নৌকা চলাচলের উপযোগী ছিল। কিন্তু বর্তমানে নাব্যতা অনেক কমে গেছে। এই নদীর পূর্ব তীরেই বংশীহারি থানা অবস্থিত।

পুনর্ভবাঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি উল্লেখযোগ্য নদী হল পুনর্ভবা। এর গতিপথ বাংলাদেশের দিনাজপুর থেকে ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার উত্তর সীমান্ত দিয়ে। সেখান থেকে নদীটি ক্রমশ দক্ষিণবাহী হয়ে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের মধ্যবর্তী সীমারেখা টেনে পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই নদীরই পূর্বতীরে অবস্থিত ইতিহাস খ্যাত ‘দেবকোট’ বা ‘বাণগড়’।

আত্রেয়ী/আত্রাই ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিখ্যাত নদী আত্রেয়ী। নদীটি বাংলাদেশ থেকে প্রবাহিত হয়ে কুমারগঞ্জ থানার উত্তর সীমা দিয়ে ঢুকে পড়েছে এই জেলায়। তারপর সোজা বয়ে গেছে বালুরঘাট পর্যন্ত। সেখান থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে নদীটি আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। আত্রেয়ী নদীকে বাঁচানোর জন্য ‘আত্রেয়ী বাঁচাও কমিটি’ গঠিত হয়েছে।

ইছামতী ঃ বাংলাদেশ থেকে আগত ইছামতী নদীটি কুমারগঞ্জ থানা এলাকা দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রবেশ করেছে। তারপর আত্রেয়ী নদীর সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে প্রায় ১৫ কিমি বয়ে গিয়ে রাধানগরে আত্রেয়ীর সঙ্গে মিলিত হয়ে গেছে।

যমুনাঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের একটি ছোট নদী যমুনা। বাংলা দেশ থেকে হিলি থানা এলাকায় উত্তর পূর্ব দিক দিয়ে নদীটি এই জেলায় প্রবেশ করেছে। তারপর মাত্র ৫ কিমির মতো পথ হিলি থানার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

শ্রীমতীঃ স্থানীয় ভাষায় চিরামতি বলে পরিচিত। নদীটি উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এরপর দুটি ধারায় ভাগ হয়ে কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডি থানার ত্রিসংযোগ রচনা করেছে। তারপর উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে মালদা জেলায় প্রবেশ করেছে।

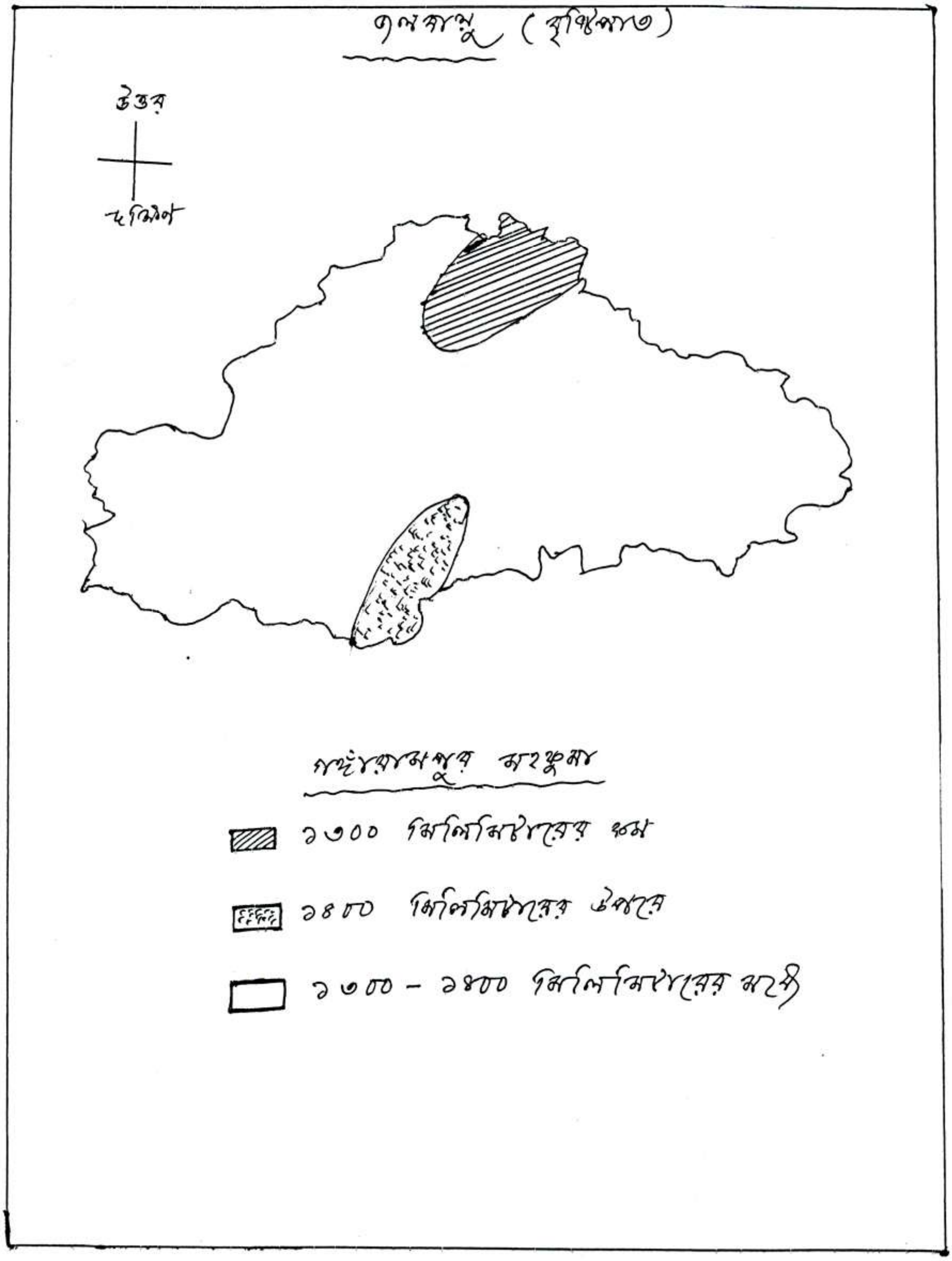
জলবায়ু (বৃষ্টিপাত)
উত্তর
দক্ষিণ
গঙ্গারামপুর মহকুমা
১৩০০ মিলিমিটারের কম
১৪০০ মিলিমিটারের উপরে
১৩০০ - ১৪০০ মিলিমিটারের মধ্যে

ইতিহাসবিখ্যাত একডালা দুর্গ এই শ্রীমতী ও বালিয়া নদীর মধ্যবর্তী স্থানেই গড়ে উঠেছিল।

উপর্যুক্ত নদ নদীগুলি ছাড়াও দক্ষিণ দিনাজপুরে এবং গঙ্গারামপুর মহকুমায় রয়েছে বালিয়া খাঁড়ি (পাথরঘাটা) ও বেশ কিছু দিঘি। তারমধ্যে তপনদিঘি, ধলদিঘি, কালদিঘি, মহীপালদিঘি, মালিয়ানদিঘি, গড়দিঘি,বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পানীয় জল, কৃষিকাজ, মৎস্যচাষ করার জন্য দিঘি নদ-নদীগুলি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। যা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয় নদী বা জলাশয় কেন্দ্রিক জনজীবনের যে ভাষা তা কৃষি বা শহুরে ব্যবসায়ী চাকুরীজীবীদের থেকে অনেকাংশেই পৃথক হয়। তাই সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চায় নদনদী ও জলাশয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

বৃষ্টিপাত ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড় হল-

২০০২	-	১৫৬৮.১৭মিলিমিটার
২০০৩	-	১৬২৬.৩২মিলিমিটার
২০০৪	-	১৬২১.০১মিলিমিটার
২০০৫	-	১৭৫৭.০৭মিলিমিটার
২০০৬	-	১১২১.০২মিলিমিটার
২০০৭	-	১৬২৮.৩৬মিলিমিটার
২০০৮	-	১৪৯৬.১৮মিলিমিটার
২০০৯	-	১৬০৫.০৩মিলিমিটার

কুমারগঞ্জ, হিলি এবং বালুরঘাটের পূর্বের অংশের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় সবসময় ১৪০০ মিলিমিটারের ওপরে থাকে। গঙ্গারামপুর মহকুমার বংশীহারি থানায় ১৪০০ মিলিমিটারের ওপরে কিছু অংশে গড় বৃষ্টিপাত হয়। এবং কুশমন্ডি থানার করঞ্জি, উদয়পুর অঞ্চলে ১৩০০ মিলিমিটারের কম বৃষ্টিপাত হলেও গঙ্গারামপুর মহকুমার বেশিরভাগ অঞ্চলের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৩০০-১৪০০ মিলিমিটারের মধ্যে থাকে। দক্ষিণ দিনাজপুরের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তাই ১৩০০-১৪০০ মিলিমিটারের মধ্যে বলা যায়।

মৃত্তিকা ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরে দুই ধরণের মৃত্তিকা দেখা যায়- নবীন পাললিক ও পুরাতন পাললিক মৃত্তিকা। অর্থাৎ সমগ্র জেলাটি পাললিক মৃত্তিকা দিয়ে গঠিত। বালুরঘাট মহকুমার

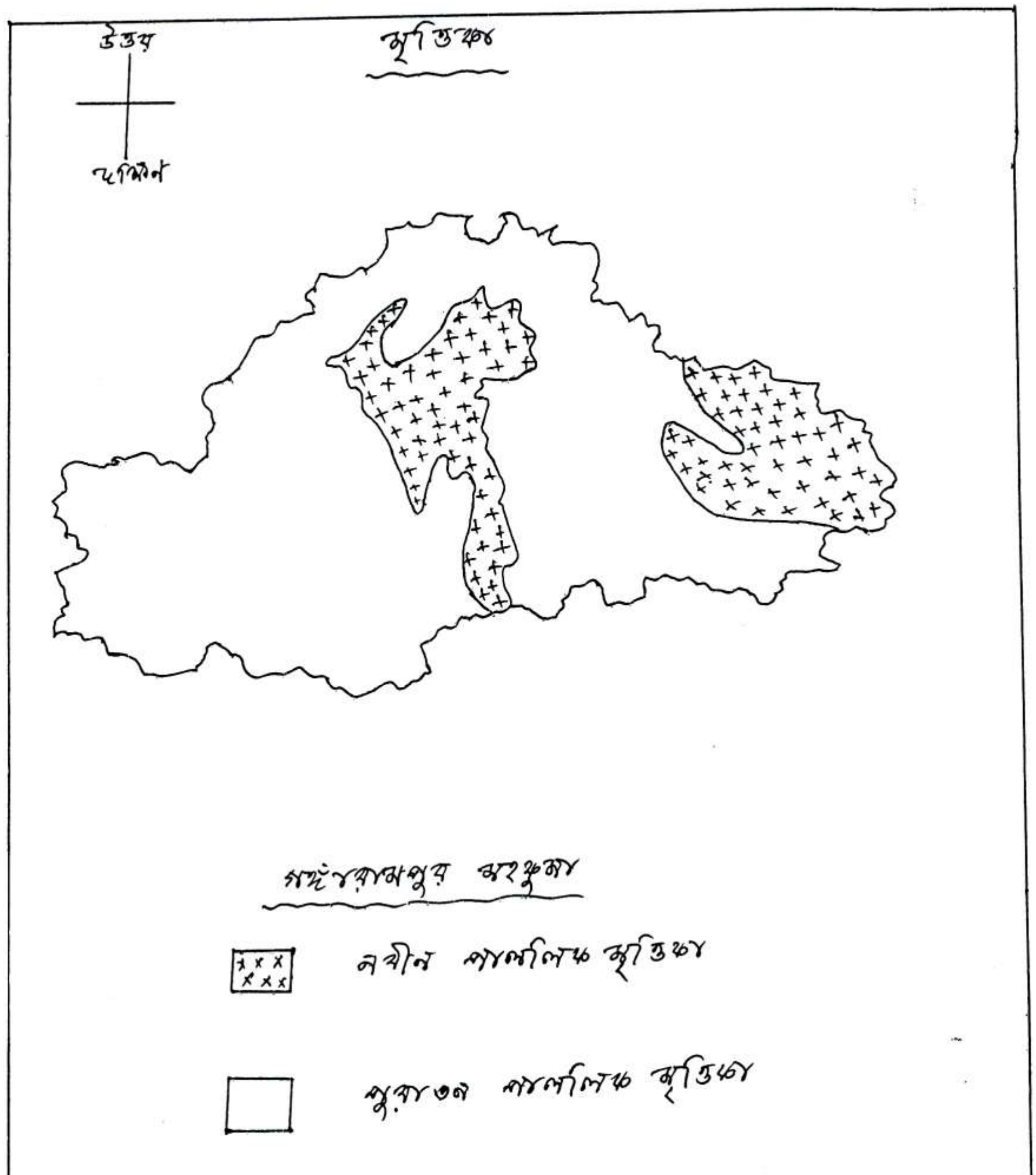
মৃত্তিকা
উত্তর
দক্ষিণ
গঙ্গারামপুর মহকুমা
নবীন পাললিক মৃত্তিকা
পুরাতন পাললিক মৃত্তিকা

সাফানগর, সমজিয়া, জাকিরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে শুধুমাত্র নবীন পাললিক মৃত্তিকা দেখা যায়। বাদবাকী সমস্ত অঞ্চল পুরাতন পাললিক মৃত্তিকা দিয়ে গঠিত। গঙ্গারামপুর মহকুমার অশোকগ্রাম, বাসুরিয়া, গাঙ্গুরিয়া, বাগিচাপুর ও কুশমন্ডি অঞ্চলে নবীন পাললিক মৃত্তিকা দেখা যায়। এছাড়া সমস্ত অঞ্চলে পুরাতন পাললিক মৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয়। পাললিক মৃত্তিকার মধ্যেও আবার উর্বরতা, জলধারণ ক্ষমতার প্রভেদ রয়েছে। পলি বা বালি মাটির জলধারণ ক্ষমতা খুব কম এবং খেয়ার এলাকার জলধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি।

ভারত -বাংলাদেশ সীমানা ঃ ভারত ও বাংলাদেশের ২১২ কিমি এলাকা সীমান্ত এই জেলার মধ্য দিয়ে গেছে। যেসব থানা সীমান্ত এলাকার মধ্যে পড়েছে সেগুলি হল -

১। হিলি - ৬০ কিমি.
২। বালুরঘাট - ২৫ কিমি.
৩। কুমারগঞ্জ - ৪৯ কিমি.
৪। তপন - ২৪ কিমি.
৫। গঙ্গারামপুর - ৩৬ কিমি.
৬। কুশমন্ডি - ১৮ কিমি.

অর্থাৎ ১৫৮ কিমি. বালুরঘাট মহকুমা ও ৫৪ কিমি গঙ্গারামপুর মহকুমার মধ্যে সীমান্ত এলাকা পড়েছে।

৩.৮ **বনভূমি ও ভূ-প্রকৃতি ঃ** দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কোনো পাহাড় বা পর্বত নেই। বৈরহাট্টা ও বাণগড়ের আশেপাশে দুই একটি টিলা দেখতে পাওয়া যায়। যাদের স্থানীয় ভাষায় 'ধুম' বলা হয়। এই জেলায় প্রাকৃতিক বনভূমি নেই বললেই চলে। তবে বনবিভাগ সৃষ্ট বনভূমি এবং পতিত জমিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে লাগানো প্রচুর গাছ চোখে পড়ে। ফলজ ও বনজ উদ্ভিদের সমারোহে এই জেলা চিরসবুজ হয়ে থাকে। আম, জাম, লিচু, খেজুর, তাল, কাঁঠাল, নারিকেল, কুল প্রভৃতি গাছির বিপুল সমাহার এই জেলার সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও বাঁশ, শিরিস, বাবলা, ইউক্যালিপটাস, মেহগণি,সেগুন, করই, বট, অশ্বত্থ, শিশু, কদম, নিম প্রভৃতি গাছ এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। বর্তমানে ব্লক ও পঞ্চায়েতের উদ্যোগে রাস্তার ধারে ধারে গাছ লাগানো হওয়ায় এই জেলায় গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

ভূ-প্রকৃতিগত দিক থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা উত্তরের সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত।

অনেকে মনে করেন হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের পলি বয়ে এসে এই অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। এই জেলাটি প্রায় সমতল ভূমিবিশিষ্ট তবে উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু হওয়ায় সমস্ত নদী উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে মালদা অথবা বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে গেছে।

৩.৯ জনগোষ্ঠীর পরিচয় ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। এদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষই সর্বাধিক তবে কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টান ধর্মের লোকও চোখে পড়ে। গঙ্গারামপুর মহকুমাতেও হিন্দু মুসলিম ও খ্রীষ্টান ধর্মের লোক দেখা যায়। ২০০১ সালের জনগণনানুযায়ী দক্ষিণ দিনাজপুরের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৫,০২,৬৪৭ জন। ২০১১ সালে যা হয়েছে ১৬,৭৬,২৭৬ জন। হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার পরিসংখ্যান ২০১১ সালের এখনও হাতে আসেনি। তাই হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার তথ্য আমরা ২০০১ সালের জনগণনানুযায়ী তুলে ধরলাম -

থানার নাম	হিন্দু	মুসলমান	খ্রীষ্টান	অন্যান্য	মোট
বালুরঘাট	৩,১৮,৫৪৪	৪০,৩০১	৫,৪৩২	২৬	৩,৬৪,৩০৪
হিলি	৬০,৮৮৫	১৪,৬৩৭	১,৬৫০	১০৩	৭৭,২৭৫
কুমারগঞ্জ	৮৬,১৪১	৬৫,২২১	১,৬২৮	০	১,৫২,৯৯০
তপন	১২,০৪৪৭	১,০১,৫২২	৩,৯৯৪	৬২	২,২৬,০২৫
গঙ্গারামপুর	১,৭২,৯৩১	৮৪,৬৫৩	২,৫২৮	৫৭	২,৬০,১৬৯
বংশীহারি	৭৬,৬০৯	৪৩,৬২৪	১,৮০২	২৪	১২,২,০৫৯
হরিরামপুর	৪৪,৭৫৬	৭৮,৮৮২	১,২৫৬	০	১,২৪,৮৯৪
কুশমণ্ডি	১,২৯,৮৬৫	৪৫,৬৮৯	১,৩৬৪	১৩	১,৭৪,৯৩১

দক্ষিণ দিনাজপুরে মোট ৬৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। যার মধ্যে গঙ্গারামপুর মহকুমার অন্তর্গত ৩০টি গ্রামপঞ্চায়েত। দক্ষিণ দিনাজপুরের অন্যান্য তথ্যগুলি নিচে দেওয়া হল - ২০১১ সাল অনুযায়ী।[২৫]

গ্রাম -	১,৬৩১টি		
শহর -	৭টি		
জনসংখ্যা-	১,৬৭,৬,২৭৬ জন (২০১১)	- ১,৫০,৩,১৭৮ (২০০১)	
পুরুষ -	৮,৫৭,১৯৯ জন ('')	- ৭৭,০,৩৩৫ ('')	

মহিলা -	৮১,৯,০৭৭('')	৭৩,২,৮৪৩('')

গ্রাম - ১৪,৩৯,৯৮১ জন= ৮৫.৯০%

শহর - ২৩,৬,২৯৫ জন= ১৪.১০%

	পুরুষ	শতাংশ	মহিলা	শতাংশ	সার্বিক হার
শিক্ষা-	৫৯,৬,৪৭৪	৭৮.৩৭	৪৮,৭,২১১	৬৭.০১	৭২.৮২
তপশিলীজাতি	২৪,৮,৩১২	২৮.৯৭	২৩,৪,৪৪২	২৮.৬২	২৮.৮০
তপশিলী উপজাতি	১৩,৮,০২৫	১৬.১০	১৩,৭,৩৪১	১৬.৭৭	১৬.৪৩
কর্মহীন	৩৫,৭,৬৩৯	৪১.৭২	৬১,৫,৬৫০	৭৫.১৬	৫৮.০৬
কৃষক	১৬,৭,৯৬৪	৩৩.৬২	২৫,৩১২	১২.৪৪	২৭.৪৯
কৃষিমজুর	১৭,১,৫৯০	৩৪.৩৫	১০,৮,৩৪২	৫৩.২৬	৩৯.৮২
এক দশকে বৃদ্ধি ২০০১-২০১১	৮৯,৬১১	১১.৬৭	৮৮,৯২০	১২.১৮	১১.৯২

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য ঃ-

১। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার মধ্যে জনসংখ্যা সবচেয়ে কম।

২। রাজ্যের মধ্যে অষ্টম স্থান, তপশিলী উপজাতির জনসংখ্যা হিসেবে এবং সপ্তদশ স্থান হল তপশিলী জাতির জনসংখ্যা হিসেবে।

৩। জনঘনত্ব ৭৫৫ জন। রাজ্যে স্থান - চতুর্দশ।

৪। প্রতি ১০০০ পুরুষে মহিলার সংখ্যা ৯৫৬ জন। রাজ্যে স্থান - ষষ্ঠ।

৫। শিক্ষার হার ৭২.৮ শতাংশ। রাজ্যে স্থান - ত্রয়োদশ।

৬। আয়তনের দিক থেকে রাজ্যে ষষ্ঠদশ।

আমরা এবার গঙ্গারামপুর মহকুমার চারটি থানা সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেখে নেব ঃ-

গঙ্গারামপুর ঃ গঙ্গারামপুর থানায় মোট ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। যথা -

১। সুকদেবপুর ২। বেলবাড়ি নং-১ ৩। বেলবাড়ি নং-২ ৪। নন্দনপুর ৫। দমদমা ৬। গঙ্গারামপুর ৭। জাহাঙ্গিরপুর ৮। বাঁশুরিয়া ৯। চালুন ১০। উদয় এবং ১১। অশোকগ্রাম।

গঙ্গারামপুর থানার জনসংখ্যা - ২০,৬,৬৪০ জন।

বংশীহারি ঃ মোট ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। যথা -

১। শিবপুর ২। গাঙ্গুরিয়া ৩। মহাবাড়ি ৪। ব্রজবল্লভপুর এবং ৫। এলাহাবাদ।

মোট জনসংখ্যা - ১২,২,০৯১ জন।

হরিরামপুর ঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৬টি। যথা -

১। বৈরহাট্টা ২। বাগিচাপুর ৩। শিরশি ৪। পুন্ডরি ৫। গোকর্ণ ও ৬। সৈয়দপুর

মোট জনসংখ্যা - ১২,৪,৯২৭ জন।

কুশমন্ডি ঃ গ্রামপঞ্চায়েতের সংখ্যা ৮ টি। যথা -

১। আকচা ২। কামজি ২নং ৩। উদয়পুর ৪। কুশমন্ডি ৫। দিউল ৬। বেরুইল ৭ । কালিকামোড়া ও ৮। মালিগাঁও

মোট জনসংখ্যা - ১৭,৫,০৮৬ জন।

গঙ্গারামপুর মহকুমার আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য আমরা প্রত্যেক গ্রামপঞ্চায়েতভেদে গ্রামসংসদ, রাজ্যসড়ক, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরি ও পরিবারের সংখ্যা সারণির মাধ্যমে তুলে ধরলাম। উপরিউক্ত থানাগুলির গ্রামপঞ্চায়েতের যে ক্রমসংখ্যা সেই হিসেবেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে দেখানো হবে - তাদের নাম দেওয়া হবে না। আমরা দক্ষিণ দিনাজপুরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের জিপি ওয়াইস ডিটেলস থেকে যে সব তথ্য পেয়েছি তার কিছু তুলে দেওয়া হল।

পরের পৃষ্ঠায় ছকটি দেওয়া হল'-

]

সংখ্যা	গ্রামসংসদ	রাজ্যসড়ক	পাকারাস্তা	কাঁচারাস্তা	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মাদ্রাসা বিদ্যালয়	কলেজ	লাইব্রেরি	লাইব্রেরী	পরিবার
১	১৮টি	----	১১কিমি	-------	২২টি	১টি	X	X	X	X	৫০০৪টি
২	১০টি	----	২ কিমি	-------	৭টি	X	X	X	X	X	-------
৩	১৭টি	----	৮কিমি	-------	১২টি	১টি	X	X	X	X	৩৫৫২টি
৪	১৬টি	৫কিমি	৩কিমি	৫৫কিমি	২০টি	২টি	X	X	X	১টি	-------
৫	----	২কিমি	২কিমি	৭কিমি	৭টি	X	১টি	X	X	X	-------
৬	১১টি	৭কিমি	৭কিমি	৩০কিমি	১০টি	২টি	X	X	১টি	১টি	৩৩৯৩টি
৭	১৩টি	৫কিমি	১কিমি	-------	১৭টি	১টি	X	X	X	X	-------
৮	১৪টি	১০কিমি	১৫কিমি	-------	১৭টি	X	১টি	X	৩টি	১টি	৪৪০০টি
৯	১৩টি	X	-------	-------	১৭টি	১টি	৩টি	X	X	১টি	-------
১০	১৫টি	৯কিমি	১০কিমি	৪০কিমি	১৬টি	১টি	৩টি	X	X	৪টি	৩২৩৬টি
১১	১৪টি	৪কিমি	২কিমি	৬৫কিমি	১৭টি	১টি	১৪টি	X	X	১টি	২৯৯২টি
১	২৩টি	১৫কিমি	৫০কিমি	৫৮কিমি	২২টি	২টি	১টি	X	১টি	১টি	৬৭৮৮টি
২	১৭টি	২কিমি	২কিমি	২৫০কিমি	২১টি	১টি	X	X	X	২টি	২৭৬৮টি
৩	২০টি	৭.৫কিমি	-----	১০২কিমি	১৮টি	১টি	X	X	X	১টি	৫৬১৪টি
৪	১৬টি	৪কিমি	৮কিমি	৮০কিমি	১৮টি	X	X	X	X	১টি	৪৫০৮টি
৫	১৪টি	X	৮কিমি	৬১কিমি	১৭টি	X	১টি	X	X	১টি	৩৯৯৭টি
১	১৩টি	৩.৫কিমি	----	৩৫কিমি	১৬টি	X	১টি	X	X	X	-------
২	১৯টি	১কিমি	২কিমি	১০কিমি	১৭টি	২টি	১টি	X	১টি	১টি	৫০৯৯টি
৩	৯টি	X	----	----	৯টি	১টি	X	X	X	১টি	৩০১৮টি
৪	১৪টি	৫কিমি	৫কিমি	----	১৬টি	X	X	X	X	৩টি	-------
৫	১৫টি	X	----	----	১২টি	২টি	X	X	X	১টি	৪৮৫০টি
৬	১৫টি	৭কিমি	৪৫কিমি	----	১৭টি	১টি	X	X	X	১টি	৩৫৬৮টি
১	১৪টি	১৩কিমি	৭কিমি	২০কিমি	১৮টি	১টি	X	X	X	১টি	-------
২	১৫টি	X	৫কিমি	৫০কিমি	১৫টি	২টি	১টি	X	X	১টি	৪৩৫২টি
৩	১৫টি	X	৪কিমি	৫০কিমি	২১টি	১টি	X	X	X	X	-------
৪	১৩টি	X	১৪কিমি	৪৮কিমি	২০টি	১টি	X	X	X	২টি	-------
৫	১৫টি	৫কিমি	৫কিমি	৫০কিমি	১৪টি	১টি	X	X	X	X`	-------
৬	১৪টি	X	----	৫০কিমি	১৭টি	১টি	১টি	X	X	১টি	৩৭২০টি
৭	১২টি	৫কিমি	৫কিমি	৫কিমি	১৭টি	১টি	১টি	X	X	১টি	৩৫০০টি
৮	১৫টি	৩কিমি	৬কিমি	৫০কিমি	২০টি	২টি	X	X	X	X	-------

এই তালিকাটির মধ্যে x চিহ্ন = অস্তিত্ব নেই, এবং ——— চিহ্ন = অস্তিত্ব আছে কিন্তু তথ্য পাওয়া যায়নি অর্থ বহন করছে।

ধর্মীয় পরিচয় ঃ পূর্বে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি, গঙ্গারামপুর মহকুমায় মোট হিন্দুর পরিমাণ ৪২,৪১,১৬১ জন এবং মুসলমান২৫,২,৮৪১ জন। এছাড়াও খ্রীষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে ৭০৪৪ জন। হরিরামপুর থানায় আবার মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক হিন্দুদেরও ছাড়িয়ে গেছে। তবু হিন্দুর সংখ্যাগরিষ্ঠতাই মহকুমাটিতে রয়েছে সার্বিকভাবে। হিন্দুর পরেই রয়েছে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্থান। খ্রীষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায় খুবই কম সংখ্যক রয়েছে। হিন্দু সমাজভুক্ত লোকেরা হলেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, সাহা, গোয়ালা, জেলে, কপালী, কুম্ভকার, নমশুদ্র, মুচি, নাপিত, রাজবংশী প্রভৃতি। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক খুবই কম দেখা যায়। কোনো কোনো পাড়ায় দুই একটি ব্রাহ্মণ পরিবার কদাচিৎ দেখা মেলে।

গঙ্গারামপুর মহকুমার হিন্দু সমাজভুক্ত মানুষদের একটি বড় অংশ বাংলাদেশ থেকে আগত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১ লাখ ১৫ হাজার ৫শো ১০ জন উদ্বাস্তু আশ্রয় গ্রহণ করেন।[২৬] এই আগন্তুক সংখ্যার অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। এই পরিসংখ্যানের বাইরে এখনও বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে শত শত মানুষ এই জেলায় প্রবেশ করছে। দক্ষিণ দিনাজপুরে ভোটের কার্ড ছাড়া মানুষের সংখ্যা হাজার হাজার। কপালি, রিফিউজি পাল যত রয়েছে এই জেলায় তার শতকরা একশ ভাগই ওপার বাংলা থেকে আগত। এছাড়া বহু কুর্মী মাহাতোদের দেখা যায় যাদের পূর্বপুরুষ বাংলাদেশ থেকে আসা।

দক্ষিণ দিনাজপুরে দুই ধরণের ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমান সমাজের লোকদের দেখতে পাওয়া যায় - ক. আস্রফ বা শরিফ এবং খ. আজলাফ। শরিফরা সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম হলেও তারাই সামাজিক বিচারে অভিজাত এবং শিক্ষাদীক্ষায় যথেষ্ট উন্নত। আর আজলফরা সংখ্যায় অধিক হলেও সামাজিক বিচারে তারা সাধারণ শ্রেণির মানুষ। এরা কৃষিনির্ভর এবং হিন্দু সমাজের সঙ্গে এদের সম্পর্কও বেশ হৃদ্য।[২৭]

ভাষা সম্প্রদায় ঃ

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও জনগণের প্রধান ব্যবহৃত ভাষা ও মাতৃভাষা হল বাংলা ভাষা। কিন্তু এই জেলার জনগোষ্ঠীতে যেহেতু বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন প্রদেশ থেকে জীবিকার্জনের প্রয়োজনে আগত অবাঙ্গালী জনগণ রয়েছেন তাই বাংলা মূল ভাষারূপে ব্যবহৃত হলেও ভিন্ন ভাষা সম্প্রদায়ের অস্তিত্বও

এখানে লক্ষিত হয়।

১৯৬১ সালের জনগণনা প্রতিবেদন অনুযায়ী পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ভাষা ব্যবহারকারী জনসংখ্যার আনুপাতিক হার হল -

মাতৃ ভাষারূপে বাংলা ব্যবহার করেন - ৭২.১৯শতাংশ লোক

মাতৃভাষারূপে উর্দু ব্যবহার করে - ১০.১৪ শতাংশ লোক

মাতৃভাষারূপে সাঁওতালি ভাষা ব্যবহার করেন - ৯.২৯ শতাংশ লোক

মাতৃভাষারূপে কুরুক/ওঁরাও ব্যবহার করেন- ১.৪৪ শতাংশ লোক

মাতৃভাষারূপে মুন্ডারী ভাষা ব্যবহার করেন- ০.৮৮ শতাংশ লোক

মাতৃভাষারূপে হিন্দি ব্যবহার করেন- ৫.৩৮ শতাংশ লোক

১৯৭১ এ মাতৃভাষারূপে বাংলা ও অন্যান্য ভাষা ব্যবহারকারী জনগণের পরিসংখ্যান -

মাতৃভাষারূপে বাংলা ব্যবহার করেন - ৭৮.২২ শতাংশ

মাতৃভাষারূপে উর্দু ব্যবহার করেন - ৬.০৫ শতাংশ

মাতৃভাষারূপে সাঁওতালি ব্যবহার করেন - ৮.৮ শতাংশ

মাতৃভাষারূপে কুরুক/ওঁরাও ব্যবহার করেন - ১.১ শতাংশ

মাতৃভাষারূপে মুন্ডারি ব্যবহার করেন - .০৬ শতাংশ

মাতৃভাষারূপে হিন্দি ব্যবহার করেন - ৫.৩ শতাংশ

১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী আমরা দেখলাম পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রধান মাতৃভাষা বাংলা। গঙ্গারামপুর মহকুমা সম্পর্কেও এই কথা খাটে তবে এই মহকুমায় উর্দু ভাষা ব্যবহারকারি লোকের দেখা পাওয়া যায় না। ওঁরাও সম্প্রদায়ের লোক খুব কম সংখ্যক দেখা গেলেও মুন্ডারি ভাষা ব্যবহারকারী মানুষও চোখে পড়ে না। এই মহকুমায় প্রায় সর্বত্রই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে সাঁওতালদের সংখ্যা এই জেলার মধ্যে সর্বাধিক। এই মহকুমার বংশীহারি, গঙ্গারামপুর এবং হরিরামপুরেও প্রচুর পরিমানে সাঁওতালদের দেখা যায়।

জীবিকার প্রয়োজনে বিশেষত ব্যাঙ্ক, রেল, সি.পি. ডব্লিউ. ডি প্রভৃতি কর্মক্ষেত্রে হিন্দি

এবং নেপালী ভাষীদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা হিন্দি ভাষায় সাধারণত কথা বললেও ব্যবহারিক প্রয়োজনে বাংলা ভাষার ব্যবহার করে থাকেন। মহাবাড়ী অঞ্চলে কিছু সংখ্যক ওঁরাও সম্প্রদায়ের লোক দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গারামপুর থানাতেও অল্প পরিমাণে ওঁরাওদের দেখা মেলে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর মহকুমার জনগোষ্ঠীরা বাংলা, সাঁওতালী, হিন্দি, ওঁরাও প্রভৃতি ভাষা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হলেও তারা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ভাব বিনিময় করে বাংলা ভাষাতেই। তাই এদের দ্বিতীয় ভাষা হল বাংলা ভাষা।

দক্ষিণ দিনাজপুরের বাংলা ভাষার বিচিত্র রূপ গড়ে উঠেছে। কর্মভেদে এবং জাতিভেদে তাদের ভাষার যে রূপ বৈচিত্র্য তা এই মহকুমার ভাষাকে দিয়েছে অন্য মাত্রা। বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্‌বাস্তুরা আবার বঙ্গালি উপভাষায় কথা বলে। তাই এই মহকুমার ভাষায় দেখা দেয় নানান বৈচিত্র্য।

জীবিকাঃ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রায় ৮০ শতাংশ লোকের জীবিকা হল কৃষিকাজ। এখানকার কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত লোকেরাই চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন -

মজুর ঃ এদের নিজস্ব কোনো জমি জায়গা নেই। এরা অন্যের জমিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এদের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করে কাজ পাওয়া এবং কাজের পরিমাণের ওপর। ফলে এদের ভবিষ্যৎ অনেকটা অনিশ্চিত বলা যায়।

ভাগচাষি ঃ এদের কার কারো অল্প স্বল্প জমি রয়েছে, আবার অনেকের তাও নেই। জীবিকা নির্বাহের জন্য এরা অন্যের জমি ভাগে চাষ করেন। উৎপন্ন ফসলের প্রায় ৫০-৬০ শতাংশ এরা পেয়ে থাকেন। এদের জীবিকা অনিশ্চিত হলেও এদের অবস্থা খুব একটা খারাপ নয়।

ছোটো কৃষক ঃ

এদের অল্প স্বল্প জমি জায়গা থাকে এবং সেই জমি এরা নিজেরাই চাষ করেন। রাসায়নিক সার উচ্চফলনশীল বীজ, জল সেচের সুবিধা পাবার জন্য এদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালো হয়।

ধনী কৃষকঃ এই কৃষকদের জমি জায়গার পরিমাণ যথেষ্টই থাকে। এরা নিজেরা জমি চাষ না করে ভাগচাষী বা খেতমজুর দিয়ে জমি চাষ করান। কৃষিজীবীদের মধ্যে এদের অবস্থা সবচেয়ে ভালো হয়।

গঙ্গারামপুর মহকুমায় এমনকি পুরো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। এখানে শিল্প কারখানা একেবারে নেই বললেই চলে। ইন্টারনেট খুললে দক্ষিণ দিনাজপুর সংক্রান্ত যে কথাগুলি প্রথমেই চোখে পড়ে রা হল - Dakshin Dinajpur is a 'non-industry' district having no large scale industry. As for transport, there is one state highway with only 3 km. of National highway no 34 falling within the district. Dakshin Dinajpur is the 'most backward district. তাই দক্ষিণ দিনাজপুরের বেশিরভাগ লোককে কুটির শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। এছাড়াও রয়েছে জাতিগত পেশা। ধোকড়া তৈরি, মুড়ি ভাজা, বাঁশের কাজ করে মহিলারাও আয় করেন। হাঁস, মুরগি পালন করেও কেউ কেউ সংসার নির্বাহ করার প্রচেষ্টা করেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের একটি বড় অভিশাপ হল দারিদ্র্য । এর ফলে ভিন রাজ্যে প্রচুর পুরুষ মহিলাকে কাজের জন্য বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয়। আমরা ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি গ্রামগুলো প্রায় পুরুষ শূন্য । দাদন খাটার জন্যে তাদের বাড়ি ছাড়তে হয়। মিড ডে মিল রান্না করার জন্য একেকটি বিদ্যালয়ে দশ বারোটি করে গোষ্ঠীর নাম দেখা যায়। সেই রান্না করে মাসে জন প্রতি২৫০-৩০০ টাকা পাওয়া যায় এবং কিছু অবশিষ্টাংশ ডাল-ভাত মেলে, সেই রান্না করার জন্যেও বিদ্যালয়গুলিতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। অর্থনৈতিক অবস্থার এমন করুণ দৃশ্যও এই জেলায় দেখা যায়।

অনেকে বাধ্য হয়ে হাঁড়িয়া বা দেশি মদ তৈরির ব্যাবসা ধরে। প্রথমে শুধু সাঁওতালরা হাঁড়িয়া বানাত কিন্তু বর্তমানে কুর্মী মাহাতো, পলিয়া, কর্মকারদেরও হাঁড়িয়া বানাতে দেখা যায়। গ্রামের কিছু কিছু ছেলে যারা বাড়ি ছাড়তে পারেনা তারা ছাদ ঢালাইয়ের কাজে যায়। সেই কাজও এত কম মেলে যে, তার উপর নির্ভর করে সংসার চলে না। কর্মহীন অবস্থায় আড্ডা মেরে, তাস খেলে সাবালক ছেলেরা দিন গুজরান করে। বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুরে সকালবেলা করে মজুরের যে হাট বসে তাতে মজুরদের জোয়ার দেখলেই বোঝা যায় কাজের জন্যে মানুষের কি করুণ আর্তি। যাতায়াত কুড়ি-বাইশ টাকা খরচ করেও অনেকে কাজ পাওয়ার আশায় এই হাটে আসে। তবু অনেককে কাজ না পেয়েই ফিরে যেতে হয়। টাকার জন্য অনেক মহিলাদের গোপনে দেহ বিক্রিও করতে হয়। শতকরা ৪০ শতাংশ মানুষ এই জেলায়

দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে।

শিক্ষা ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষার হার। এই জেলাটি অর্থনৈতিক দিক থেকে পেছন সারির হলেও শিক্ষার দিক থেকে বেশ এগিয়ে। জেলার মোট শিক্ষিত লোক হল (২০১১) ১,০৮৩,৬৮৫ জন। তার মধ্যে পুরুষ ৫,৯৬,৪৭৪ জন ও মহিলা ৪,৮৭,২১১ জন। পুরুষের শতকরা হার হল ৭৮.৩৭ শতাংশ এবং মহিলার শতকরা হার হল ৬৭.০১ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার সার্বিক হার যেখানে ৭৬.২৬ শতাংশ সেখানে দক্ষিণ দিনাজপুরের সার্বিক হার হল ৭২.৮২ শতাংশ। রাজ্যে শিক্ষার দিক থেকে দক্ষিণ দিনাজপুরের স্থান ত্রয়োদশতম। শিক্ষার এই অগ্রগতির কারণ হল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ের পর্যাপ্ত পরিমাণ। শুধু প্রাথমিক, জুনিয়ার, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় নয়, প্রতিটি ব্লকে একটি করে মহাবিদ্যালয় তৈরি হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে শিশুশিক্ষা কেন্দ্র ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের প্রভাব। আমরা অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুরের সঙ্গে ২০১১ সালের দক্ষিণ দিনাজপুরের বিদ্যালয়ের সংখ্যা তুলে ধরে ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করব-

অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ

সাল		মোট
১৯৪৭	-	৫৫১টি
১৯৫৬-৫৭	-	৯৪৯টি
১৯৬০-৬১	-	১০৬৭টি
১৯৮১-৮২	-	২৪৪০টি

অন্যান্য শ্রেণির বিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ

১৯৪৭ মিডল স্কুল	-	৩১টি
১৯৬০-৬১ মিডল স্কুল	-	৬১টি
১৯৮১-৮২ মিডল স্কুল	-	৯৫টি
১৯৪৭ হাই স্কুল	-	৬টি
১৯৫৬-৫৭হাই স্কুল	-	১৬টি
১৯৬০-৬১হাই স্কুল	-	২৭টি
১৯৮১-৮২হাই স্কুল	-	১১৬টি

দক্ষিণদিনাজপুর জেলা - ২০০১

প্রাথমিক বিদ্যালয়	-	১১৭৭টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	-	১০৬টি
শিশুশিক্ষাকেন্দ্র	-	৫৩৫টি

একশো শতাংশ শিক্ষা এবং শিক্ষার অধিকার আইনের ফলে স্কুলছুট পড়ুয়ার সংখ্যা কমেছে। পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে, একক অভীক্ষার ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের পড়ার ভীতি অনেকটাই কাটানো গেছে। তাই গ্রামাঞ্চলের দিকেও শিক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। তবে তপশিলী উপজাতিরা এখনো পুরোপুরি এগিয়ে আসেনি। তাই তাদের জন্য আলাদাভাবে মাতৃভাষায় পড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ভাষা সমস্যা তাদের শিক্ষা গ্রহণের প্রধান অন্তরায় একথা ভুললে চলব না। কারণ পুস্তকের ভাষা তাদের দ্বিতীয় নয়, তৃতীয় ভাষা।

৩.১৪ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষকে স্বভাবতই শান্ত বলা যায়। মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, দাঙ্গা এসব থেকে তারা সবসময় একটি মর্যাদাসূচক দূরত্ব তৈরি করে রাখে। তাই ওপার বাংলা থেকে দেশভাগের পর থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই পারে এসে উঠলেও বাঙ্গাল ও ঘটিদের এই জেলায় দ্বন্দ্ব কোনোদিনই লাগে নি। বরং ‘দিবে আর নিবে’-র ধারা তারা বজায় রেখেছে। ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে অভিবাসিতদের সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পোশাক-আশাক, খাদ্যাভাস এমনকি মানসিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও তারা কখনোই প্রত্যক্ষ বিবাদে জড়ায় নি। বরং একে অপরের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটিয়েছে।

তবে স্থানীয়দের সঙ্গে অভিবাসিতদের শত অমিল থাকলেও তারা ধর্মগত ঐক্যে অভিন্ন ছিল। যা ভিন্ন হয়ে ওঠে মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে । কেননা মুসলমানরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। যাদের ধর্মীয় এবং আচরণগত প্রভেদ হিন্দুদের সঙ্গে এতটাই যে, একে অপরের বিপরীতমুখী বলা যায়। তবুও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এই জেলায় একটি সম্প্রীতির পরিবেশ লক্ষ করা যায়। কিছু রাজনৈতিক কুচক্রীদের কলকাঠিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দুই একবার তৈরি হলেও বলা যায় হিন্দু ও মুসলিমদের ঐকমত্য এই জেলায় যথেষ্টই আছে।

ঈদের সময় মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকের বাড়িতে যেমন হিন্দুরা নেমন্তন্ন খেতে যায়,

ঠিক তেমনই দুর্গাপূজা, কালীপূজার সময় মুসলমানরা হিন্দুদের বাড়িতে আসে। মহরম ও পিরের মেলায় জাতি ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করে। পিরের কাছে সিন্নি মানত করতে অনেক হিন্দুকেই দেখা যায়। বড়দিনে গির্জায় হিন্দু, মুসলমান সকলেই উপস্থিত হয়। বিহারিদের ছট্ পূজা বহু বাঙালিরাই এখন করে।

উৎসব, অনুষ্ঠানে একে অপরকে আমন্ত্রণ করা হয়। এইভাবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সর্বত্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক হার্দিক বন্ধন লক্ষ করা যায়।

তথ্যসূত্র

১। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে অভিবাসিত চলন বিল অঞ্চলের জনগণের কথ্যভাষা ঃ একটি ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা, জীবন কুমার ঘোষ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১১, পৃ ঃ-১

২। দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, ধনঞ্জয় রায়, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০০৬, পৃঃ-১

৩। বাংলাদেশের ইতিহাস, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, পৃঃ- ৭

৪। ধনঞ্জয় রায়, ঐ, পৃ ঃ-১

৫। ধনঞ্জয় রায়, ঐ, পৃঃ-২

৬। দিনাজপুরের বিপ্লবী আন্দোলন, সমিত ঘোষ, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১২, পৃঃ-১৮

৭। ধনঞ্জয় রায়, ঐ, পৃঃ-২

৮। দক্ষিণ দিনাজপুরের পুরোনো দীঘিগুলি প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে, সমিত ঘোষ, বর্তমান, ০৫/১২/২০০৬

৯। ধনঞ্জয় রায়, ঐ, পৃঃ-২

১০। ধনঞ্জয় রায়, ঐ, পৃঃ-২

১১। সমিত ঘোষ, ঐ, পৃঃ-১৯

১২। সমিত ঘোষ, ঐ, পৃঃ-২১

১৩। ধনঞ্জয় রায়, ঐ, পৃঃ-৩

১৪। সমিত ঘোষ, ঐ, পৃঃ-২০

১৫। জীবন কুমার ঘোষ, ঐ, পৃঃ-৩

১৬। ধনঞ্জয় রায়, ঐ, পৃঃ-৬

১৭। ধনঞ্জয় রায়, ঐ, পৃঃ-৬-৭

১৮। বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), রমেশ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, পৃঃ-২

১৯। ধনঞ্জয় রায়, ঐ, পৃঃ-৮

২০। ধনঞ্জয় রায়, ঐ, পৃঃ-১০৫

২১। Kirataa-Jana-Kriti, Suniti Kr. Chatterjee, P-63

২২। ধনঞ্জয় রায়, ঐ, পৃঃ-১৪৪

২৩। West Bengal District Gazatteers, West Bengal, 1965,

২৪। তথ্যগুলি সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে।

২৫। District Census Handbook, Dakshin Dinajpur, West Bengal
Census of India 2011, Series - 20 part XII-B, PCA, ইন্টারনেট।
২৬। ধনঞ্জয় রায়, ঐ, পৃঃ-৩৪৬
২৭। জীবন কুমার ঘোষ, ঐ, পৃঃ- ২০